নগুগির ভাষা–ভাবনা ও আমরা

এলহাম হোসেন

ফ্রান্জ ফানো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Black Skin White Masks* - গ্রন্থে জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করেন, কোন একটি ভাষা ব্যবহার করার অর্থ হলো ঐ ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করা। মনস্তাত্ত্বিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচক হিসেবে ফানোর এই পর্যালোচনার মধ্যে সামান্যতম অতিরন্জন নেই। ভাষা তো ভাবনা ও চেতনারই বাহন। সুতোর সমর্থন ছাড়া যেমন ফুলগুলো মালা হয়ে উঠতে পারে না, তেমনি ভাষার শরীর ছাড়া চেতনা, মনন ও নন্দনের উপলব্ধিগুলোর আত্মাও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে না। শুধু চেতন নয়, অবচেতন বা অচেতন মনের কাঠামোও তৈরী করে এই ভাষাই। তাই জাঁক লাঁকার মতে, মানব-মনের অচেতন স্তর, যা মানুষের স্বত্ত্বা ও পরিচয় নির্মাণ করে, তা ভাষার মতোই কাঠামো-বিন্যস্ত। আর যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক ঔপনিবেশিকতা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতার চেয়ে অধিকতর বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর, তাই ঔপনিবেশকারীরা প্রথমেই টার্গেট করে ভাষাকে। এ-ব্যাপারটা যেমন আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঔপনিবেশিকরনের অস্ত্র হিসেবে ভাষাকে ব্যবহার করতে গিয়ে এরা কিছু পরিস্থিতি তৈরী করে, যেমন, এরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে ভাষাকে এমনভাবে জুড়িয়ে দেয় যে, স্থানীয়রা মানতে বাধ্য হয় যে, তাদের জীবনমান উন্নয়নের এবং সাফল্যের সোপান হলো ঔপনিবেশিকদের ভাষা। প্রথমে ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যম এবং পরে রাজভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয় ঔপনিবেশিকদের ভাষা। এটি আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ-উভয় স্থানের ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসেই দৃশ্যমান।

প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু করে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর কয়েক বছরের মধ্যেই যখন ভারতবর্ষের বিশাল এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হয়, তখন তারা রাজভাষা হিসেবে ইংরেজি চাপিয়ে দেয় স্থানীয়দের ওপর। শুধু চাপিয়ে দেওয়া নয় বরং এমন পরিস্থিতি তৈরী করা হয় যাতে স্থানীয়রা ভাবতে বাধ্যই হয় যে, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন, প্রাচুর্যে ভরপুর জীবীকা, মান-মর্যাদা অর্জন ও প্রান্তিক অবস্থান থেকে উত্তোরণের মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থানের অপরিহার্য মাধ্যম হলো ইংরেজি। ইংরেজরা এই সফলতা হুট করে পায় নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যাবসার খাতিরে স্থানীয়দের ফারসি ও বাংলা ভাষার খোঁজ-খবর আগে-ভাগেই নিয়ে রেখেছিল। দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালু করে ফারসি ভাষাকে, যা তখন মোঘলদের দাপ্তরিক ভাষা, টক্কর দেয় । কিন্তু খুব বেশী এগুতে পারে নি। তবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে তারা খুব দ্রুতই পুঁজির মালিক হয়ে ওঠে। আর পুঁজির আগমণ তো অপরিহার্যরূপেই রাজনৈতিক ক্ষমতারও আগমণ ঘটায়। শীঘ্রই এরা রাজনীতিতে নাক গলায়, স্থানীয় পুঁজিওয়ালাদের সাথে যোগসাজস করে সামন্ত ক্ষমতার পতন ঘটায়। ফলশ্রুতিতে পুঁজির মদদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার সূচনা হয়। এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে,

পুঁজিওয়ালাদের আধিপত্য চর্চার অন্যতম প্রধান অস্ত্র হলো তাদের ভাষা। তাদের এই ভাষা-আধিপত্য চর্চার প্রকল্পের মধ্যে আমরা উপনিবেশিত বাঙ্গালিরাও পড়ে যাই।

এ প্রসঙ্গে যতীন সরকারের পর্যালোচনা হলো, যদি প্রশ্ন করা হয় বাঙ্গালীরা ইংরেজি শিখতে শুরু করেছে কবে থেকে, তবে তার সোজাসাপ্টা উত্তর হলো– যখন থেকে ইংরেজি শিক্ষাটা তার বৈষয়িক স্বার্থের অনুকুল রূপে দেখা দিয়েছে (যতীন সরকার ১১) । ১৭৭৪ সালে যখন কলকাতায় প্রথম সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হলো তখন বাঙ্গালীরা অনুধাবন করলে যে, রাজানুকূল্য বা ইংরেজদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষাটা জানা একান্ত জরুরী। সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর সেখানে ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ অনুবাদক বা দ্বিভাষীর প্রয়োজন হলো। সুপ্রীমকোর্টের প্রথম জজ মি. এলিজা ইম্পি তার বিলাত সহযাত্রী দিল্লী নিবাসী গণেশ রামকে এই পদে নিয়োগ দেন। তাঁর সমাদর দেখে বাঙ্গালীদের টনক নড়ে। রাজানুকূল্য, ইংরেজদের প্রসাদ ও চাকরি-বাকরির সুযোগ লাভের আশায় তখন বাঙ্গালীরা তাদের সন্তানদের ইংরেজ পাদরীদের কাছে পাঠাতে লাগল। এভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন বোধ জাগ্রত হলো (যতীন সরকার, ১২)। বাঙ্গালীরা ভাবতে লাগলো, যত বেশি ইংরেজি শব্দ রপ্ত করা যাবে তত বেশি ক্ষমতা, প্রতাপ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যাবে। তাই এক রকম শ্লোক বানিয়ে ইংরেজি শব্দ মুখস্ত করার প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী ঝাপিয়ে পড়ল:

ফিলোসফার বিজ্ঞলোক প্লাউম্যান চাষা।
পাম্পকিন লাউকুমড়ো কিউকাম্বার শসা।[৪]

ইংরেজি শেখা শুরু হলো, তবে তা কেবল কতিপয় শব্দ ও অর্থ শেখা ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। এই বিদ্যা দিয়েই সমাজে বেশ সম্মান অর্জিত হলো আর এরা ইংরেজদের অফিসে সেরেস্তাদার বা কেরানির চাকুরি পেল। এর বেশী কিছু নয়। ইংরেজি শেখা ভারতীয়দের কেরানি বানানোর প্রস্তাব তো ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সংসদের হাউস অব কমন্সে মেকলের বক্তব্যেও সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। যাইহোক, ইংরেজদের তৎপরতায় শীঘ্রই বাঙ্গালিরা উপলব্ধি করলো যে, সামাজিক মর্যাদা অর্জন, ইংরেজ আনুকূল্য লাভ, ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা আছে তাদের সাথে বা কাছাকাছি থাকার অন্যতম প্রধান উপষঙ্গ হলো ইংরেজি ভাষা।

আবার ইংরেজি শেখার পেছনে শুধু ঔপনিবেশিকদের ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছাই যে প্রধান তা নয়, বরং কেন্দ্র পূনরুদ্ধার করার বাসনাও ইংরেজির প্রতি স্থানীয়দের আগ্রহী করে তোলে। এটি আচেবে বিশ্বাস করলেও নগুগি বিশ্বাস করেন না। ইংরেজরা যে ইংরেজি দিয়ে আমাদের কেরানি বানিয়েছিল সেই ইংরেজি ভাষাতেই কী রবীন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায়, সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধী প্রমূখ ভারতীয়রা ইংরেজদের বুঝিয়ে দেয় নি যে, ভারতবর্ষ নিজেই নিজেকে শাসন করতে পারে, নিজেদের অধিকার নিজেরাই সংরক্ষণ করতে পারে। আচেবে দেখছেন ভাষাকে ভাবের বাহন হিসেবে কিন্তু নগুগি দেখছেন ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে যা স্থানীয়দের মন ও মননকে শৃংখলিত করে। শেকড় থেকে দূরে নিয়ে যায়, ধার করা বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলে। ভাষা ঔপনিবেশিকদের শোষণের অস্ত্র। তাই তিনি তাঁর *Decolonising the Mind* গ্রন্থে বলেন, "The bullet was the means of physical subjugation. Language was the means of spiritual subjugation" (*Decolonising the Mind* 9).

এ কথার সত্যতা আমাদের এখানে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষেত্রে বেশ প্রযোজ্য। এরা ইংরেজি শিখে নিজেদের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের প্রহরীর খোলস তৈরী করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেশের ভাষা থেকেও অনেক দূরে সরে যায়। ভাষা তো চিন্তারই ধারক, আর চিন্তা যদি দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটে পড়ে। আর মানুষই তো সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতির সংকট তো মানুষেরই সংকট। এই সংকট কাটিয়ে উঠে ঔপনিবেশিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না যদি ঔপনিবেশিকদেরই ভাষা স্থানীয়দের কাঁধের ওপর চেপে বসে । ফলে দাসত্বের কাল দীর্ঘ হয়। এই দাসত্ব ভূখন্ড পেরিয়ে মানস কাঠামোকেও পেয়ে বসে। মানসকাঠামোকে ঔপনিবেশিকদের ভাষায় শৃংখলিত করে আত্মিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি নগুগিরও বেশ আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও আমরা দেখি। তাঁর মতে, ‘‘যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।’’ (যতীন সরকার ১৬)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৫ সালে ইংরেজ অফিসার এ. ও. হিউমের হাত ধরে। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের পাশাপাশি একটা স্থানীয় নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে তাঁদের ক্ষমতার লোক দেখানো গণতন্ত্রায়ণ করা। ১৯২০ সালে গান্ধী এর নেতৃত্বে আসার আগ পর্যন্ত এটি ইংরেজ মদদপুষ্ট অভিজাতদের দলই থাকে। তখন এর সভা-সম্মেলনের কথ্য ও লেখ্য ভাষা ছিল ইংরেজিই । রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রতিবাদে মাতৃভাষার মর্যাদা, নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ছিল। নগুগি নিজেও একাধিক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, তিনি ১৯৭৭ সালে তাঁর *নগাহিকা নদিন্দা* নাটকটি স্থানীয়দের মাতৃভাষা গিকুয়ুতে লেখার ও তাদের সম্পৃক্ত করে এটি মঞ্চস্থ করার কারণে কেনীয় সরকারের রোষানলে পড়ে কারাবাসের সময় ও তার পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ও কেনিয়ায় স্থানীয় ভাষার অবস্থা ও অবস্থানের ইতিহাস প্রায় একই রকম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা ভাষা ব্যবহারের উচ্ছাস-উদ্দীপনা যতটা দেখা যায় নিম্ন পদস্থ কর্মচারী, কর্মকর্তাদের মধ্যে, ততটা আমলাশ্রেণী, শাসকশ্রেণী যারা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের প্রহরী হিসেবে কাজ করে, তাদের মধ্যে দেখা যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে এরাই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে দেশের সব ক্ষেত্র। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বজাধারী হিসেবে এরা ইংরেজির ব্যবহার ও প্রচলনকে যেভাবে সাফল্যের সোপান হিসেবে উপস্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে, বাংলাকে সেভাবে উপস্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে না। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজি হয়ে ওঠে ক্ষমতার ভাষা ও প্রতাপের ভাষা। বাস্তবতা হলো, জ্ঞানচর্চা ও বহুবিধ জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি এখনও বাংলাদেশে কেন্দ্র দখল করেই আছে। আর বাংলাকে প্রান্তিকতায় আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা এখনও ওই শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান আছেও।

কেনিয়াতেও স্বাধীনতার পর এরকমই হয়েছে। সেখানে স্থানীয় ১০ লক্ষ মানুষের ভাষা গিকুয়ুতে লিখতে গিয়ে নগুগিকে আমলা, ক্ষমতাবান ও সাম্রাজ্যবাদের প্রহরীদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়। কিন্তু নগুগি এই অবস্থান থেকে কখনও সরে আসেন নি। মাতৃভাষার ব্যবহার যেমন ব্যক্তিকে তার

সংস্কৃতি ও শেকড়ের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, তেমনি বিদেশী ভাষার প্রতি দাসত্ব তাকে শেকড় ও সংস্কৃতি থেকে দূরে, বহুদূরে নিয়ে যায়। শেকড়হীন করে দেয়। তাই নিজ ভাষায় সাহিত্য রচনার পক্ষেই তাঁর অবস্থান।

আফ্রিকী সাহিত্যের ভাষা কি হবে? সোয়াহিলি, জুলু, আমহারিক, আরবী, ইগবো, না-কি গিকুয়ু? এই বিতর্ক আফ্রিকী সাহিত্যের লেখ্যরূপের উন্মেষের শুরু থেকেই। কেউ বলেন, ভাষাই সাহিত্যের পরিচয় বহন করে। আবার কেউ বলেন, বিষয়বস্তুই সাহিত্যের পরিচয় নির্দেশ করে। কেউ বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে সাহিত্যের প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। এর বিষয়বস্তুই এক্ষেত্রে এর সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পরিচয় নির্দেশ করবে। চিনুয়া আচেবেও এই মতেরই পক্ষে। ১৯৬২ সালে উগান্ডার ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে "A conference of African Writers of English Expression" শিরোনামে আফ্রিকার ইংরেজী ভাষার লেখকদের যে সম্মেলন হয়, তাতে আচেবেও উপস্থিত ছিলেন। নগুগিও ছিলেন। আচেবে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত লেখক। নগুগি বয়সে তরুণ। এখানে তখনও আফ্রিকী ভাষার লেখকদের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। ব্যাপারটা নগুগিকে ব্যথিত করে। নগুগি *Weep Not, Child* উপন্যাসের পান্ডুলিপি নিয়ে এখানে হাজির হন। এটিও ছিল ইংরেজিতে। আচেবেকে দেখান ও পরামর্শও চান। এ সম্মেলনে আচেবে সাহিত্যরচনায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের পক্ষেই মত দেন। তাঁর মতে, উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করা ইংরেজি ভাষায় লেখায় দোষের কিছু নাই, বরং এটি আফ্রিকী সাহিত্যকে আন্তর্জাতিকতা দান করবে ও সেকেন্ডারী পাঠকের কাছে নিয়ে যাবে । কিন্তু নগুগির মনে হয়েছিল, এই সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সাহিত্যিকগণ আফ্রিকী সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে ব্যর্থ হন। তাঁর মতে, ইংরেজী ভাষায় রচিত আফ্রিকী সাহিত্য খু-উ-ব বেশী হলে আফ্রো-ইউরোপীয় সাহিত্য। আফ্রিকী সাহিত্য নয়।

ব্যাপারটা হলো, নগুগি ইংরেজি ভাষাকে ঔপনিবেশিকদের ভাষা হিসেবে দেখেন; ঔপনিবেশিকরণের tool বা অস্ত্র হিসেবে দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইংরেজি ভাষার ব্যাপারে তাঁর অবস্থান নির্ধারণ করে। আসলে আফ্রিকী ভাষায় সাহিত্য রচনা করার পেছনে যে বোধ নগুগির মধ্যে কাজ করে তা হলো, আফ্রিকাকে নিজের কণ্ঠেই নিজের কথা বলতে হবে। নিজের স্বতন্ত্র voice বা কণ্ঠ থাকতে হবে, যা ঔপনিবেশিকরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। আফ্রিকার অন্যতম প্রধান দূর্বলতা ছিল এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার লিখিতরূপের অনুপস্থিতি। আর সে জায়গা দিয়েই উপনিবেশিকরা ঢুকে পড়ে। সপ্তম শতকে ঢুকেছে মুসলমান ঔপনিবেশিকরা। নিজেদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ধর্ম স্থানীয়দের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, অনেক পন্ডিত ইসলামকে আফ্রিকার ট্রাডিশনাল ধর্ম বলে আখ্যয়িত করেন। এর কারণও আছে। বর্তমানে আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগই মুসলমান। পরবর্তীতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসে ইউরোপীয়রা, প্রধানত পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজরা, তাঁদের ভাষা ও বাইবেল নিয়ে। নস্যাৎ করে স্থানীয়দের ইতিহাস, বদলে দেয় তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়। ঔপনিবেশিকদের ভাষায় হাজির করে বাইবেল, দর্শন ও সাহিত্য যা স্থানীয়দের ইতিহাসহীন, ধর্মহীন, সভ্যতাহীন হিসেবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করে। এর পেছনে নির্মম রাজনীতি অবশ্যই ছিল। বর্বর,

অসভ্য বলে চালিয়ে দিতে পারলে তাদের উপর নির্মম দাসত্বের শৃংখল চাপানো, নিপীড়নের স্টীমরোলার চালানো আর সভ্য বানানোর অজুহাতে বর্বরতার চর্চা বিনা বাধায় করা যায়। সফল হয়েছেও এরা। ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তই লক্ষ লক্ষ আফ্রিকীদের এরা দাসে পরিণত করে। আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের নানান দেশে এদের নিয়ে গিয়ে নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে এদের শ্রম নিংড়ে নেয় আর নিজেদের পুঁজির পাহাড় তৈরী করে। নিজেদের পুঁজি তৈরীর জন্য এদেরকে অমানবিকভাবে শ্রম তৈরীর কারখানায় পরিণত করে।

এই যে আফ্রিকীদের ইতিহাস বিকৃতি আর পরিচয় ধ্বংস করার যজ্ঞ, তার প্রধান অস্ত্র ছিল ঔপনিবেশিকদের ভাষা। আর এই ভাষা স্থানীয়দের স্কুল-কলেজে শেখানোর জন্যও ঔপনিবেশিকরা যে নির্মম ও অপমানজনক পন্থা অবলম্বন করত তা-ও বর্ণনাতীত। ঔপনিবেশিকরা বুঝতে পেরেছিল যে, মগজ ধোলাইয়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী উপষঙ্গ হলো ভাষা যা মানুষের চেতনা, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে, পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। তারা এ-কাজে সফলও হয়। ভারতবর্ষেও যে এ চেষ্টা এরা করেনি– তা কিন্তু নয়। মেকলের বক্তব্যই তো তার প্রমাণ। তবে এখানকার বাস্তবতা আফ্রিকার থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে জ্ঞানতত্ত্বের লেখ্যরূপের অস্তিত্ব ছিল, নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, বই-পুস্তকও ছিল। আর আফ্রিকার মাঠ এদিক থেকে ছিল ফাঁকা। তাঁদের ধর্ম আছে, কিন্তু তাঁদের ধর্মগ্রন্থ নাই। তাঁদের Orature অত্যন্ত সমৃদ্ধ, কিন্তু এর লিখিত রূপ ছিল না। এসবের অনুপস্থিতিই তো ঔপনিবেশিকদের জায়গা করে দিয়েছে। একথা বিশ্ব-বাস্তবতায় প্রমাণিত। বিশ্বের যে প্রান্তের যারাই নিপীড়িত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাদের প্রপঞ্চ বা বয়ানের লিখিত রূপের ঘাটতি রয়েছে। এ-কথা অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবোরিজিন্সদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন জেম্স কুক অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছে ঘোষণা করলেন যে, এখানে কোন মানুষ থাকে না। এই দ্বীপটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত করলাম। অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো যে, ৪০ হাজার বছর ধরে যে অ্যাবোরিজিন্সরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে এখানে বসবাস করছে তাদের কোন পাত্তাই দেওয়া হলো না।

কাজেই নগুগির কাছে ভাষা শুধু ভাবের বাহন মাত্র নয়– এটি একটা জাতির পরিচয় গঠনের প্রধানতম উপষঙ্গও বটে। এই উপলব্ধিই নগুগিকে ইংরেজি ভাষার ব্যাপারে এরূপ অবস্থান নিতে প্রনোদিত করেছে। তিনি মনে করেন, "ইউরোপীয় ভাষায় আফ্রিকার উপকরন নিয়ে লেখা সাহিত্য আদৌ আফ্রিকী সাহিত্য নয়। এটি বড়জোর আফ্রো-ইউরোপীয় সাহিত্য। তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম পর্বের লেখাগুলোকেও তিনি এই ছকে ফেলেছেন" (গানিং ৩৯)। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, আফ্রিকী সাহিত্য রচনায় ইউরোপীয় ভাষার ব্যবহার প্রাক্তন ঔপনিবেশিকদের প্রতি উত্তর-ঔপনিবেশিকদের আনুগত্য প্রকাশ করে। এটিও গোলমীই, তবে একটু ভিন্ন রূপে। কিন্তু শুধুই আফ্রিকী ভাষায় সাহিত্য রচনাই যে বিউপনিবেশিকরনের জন্য যথেষ্ট, তা নয়। তবে ''এটি মন-মস্তিস্ককে বিউপনিবেশিকরনের অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে" (গানিং ৩৯)।

দক্ষিণ আফ্রিকী লেখক মুফাষলেলে *Transition* পত্রিকার এগার সংখ্যায় ছাপা হওয়া এক চিঠিতে বলেন, ভাষা ও নৃতাত্ত্বিকতায় এত বৈচিত্র্যময় আফ্রিকাকে একিভূত করার ক্ষমতা রাখে ইউরোপীয় ভাষা, যেমন–ফরাসী ও ইংরেজি। তিনি আরও মনে করেন, এই ইউরোপীয় ভাষা দুটো সাধারণের

ভাষাও হতে পারে এবং এর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ তৈরী করা যায় ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে, এমনকি স্বাধীন দেশগুলোতেও (নগুগি ২৮৫)। চিনুয়া আচেবে ১৯৭৫ সালে 'The African writer and the English Language' শিরোনামের বক্তৃতায় ঘোষনা করেন:

> Is it right that a man should abandon his mother tongue for some one else's? It looks like a dreadful betrayal and produces a guilty feeling. But for me there is no other choice. I have been given the language and I intend to use it (নগুগি ২৪৫)।

নগুগি আচেবের এই যুক্তিগুলোর সাথে একমত হতে পারেন নি। তার *Decolonising the Mind : The Politics of Language in African Literature* বইয়ে স্পষ্ট করে ঘোষনা করেছেন,"In my view language was the most important vehicle through which that power fascinated and held the soul prisoner" (Ngugi 9).

ভাষা কীভাবে আত্মাকে শৃংখলিত করে তা নগুগি তাঁর *Secure the Base: Making Africa Visible in the Globe* গ্রন্থে দেখিয়েছেন। ঔপনিবেশিকদের ভাষা চাপানোর বিষয়টির সাথে তাদের আধিপত্যপরম্পরাবোধ বা hierarchy এর বিষয় অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িয়ে থাকে; স্থানীয়দের সাথে নেটওয়ার্কিং-এ এরা যায় না। আর hierarchy মানেই হলো উঁচুপদধারী নিচের জনকে দমন-পীড়ন করবে। কিন্তু নেটওয়ার্কিং-এ এটি হয় না। এক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়াই প্রধান। ঔপনিবেশিকরা যখন স্থানীয়দের ওপর তাদের ভাষা চাপায় তখন তারা নেটওয়ার্কিং-এ যায় না, hierarchy চর্চা করতে চায়। ফলে স্থানীয়দের ভাষাকে ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তের দিকে, আর নিজেদের ভাষাকে স্থাপন করে কেন্দ্রে।

নগুগির মাতৃভাষা গিকয়ু। ক্ষেতে-খামারে, রাস্তা-ঘাটে সবখানে স্থানীয়রা এই ভাষায় গল্প করত, গল্প শুনতো। সবাই কাছাকাছি থাকতো, কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পর যখন ঔপনিবেশিকদের ভাষা নানান অপকৌশল ও নিপীড়নের মধ্যদিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো শিক্ষার্থীদের ওপর, তখন নগুগি অনুভব করতে শুরু করলেন যে, ওদের ভাষা-সাহিত্য স্থানীয়দের নিজ স্বত্ত্বা থেকে দূরে, বহুদূরে নিয়ে যাচ্ছে। নগুগির মতে, "Thus language and literature were taking us further and further from ourselves to other selves, from our world to other worlds" (Ngugi 10).

ইংরেজি ভাষার ব্যাপারে নগুগির অবস্থান আরও ভালো করে বুঝা যায় যখন ঔপনিবেশিকদের আমদানী করা খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব বিশ্লেষণ করা হয়। নগুগি কেন খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করলেন- এই প্রশ্নটি পাঠককে ভাবায় যখন তাঁরা ঔপনিবেশিকদের ধর্ম ব্যবহারের উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেন। নগুগি জানেন, ঔপনিবেশিক আমলে ভাষার মতোই খৃষ্টধর্মও শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঔপনিবেশিকদের খ্রিস্টধর্ম যে স্থানীয়দের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্নও করেছিল সে ব্যাপারে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটা অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য। তিনি ছাত্রাবস্থায় লন্ডনে অবস্থানকালে

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায়ই যেতেন। সেখানে ধাতুতে ঢালা নিগ্রো মেয়ের মুখ দেখে বিস্ময়ে ও কৌতুহলে থমকে যান। এই নৃমুন্ডের চমৎকারিত্ব তাঁকে আগ্রহী করে তোলে আফ্রিকী সংস্কৃতি ও শিল্পের ব্যাপারে। সাথে সাথে কিছু বই-পুস্তক সংগ্রহ করে নিগ্রোদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা নেন। আফ্রিকার প্রতি তাঁর প্রীতির ভাব তৈরী হয়। এরপর ওয়াই. এম. সি. এ. র ছাত্রাবাসের এক নাইজেরীয় ইয়োরুবা ছাত্রের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সে ধর্মে খৃষ্টান। নাম N. A. Fadipe. সূনীতি কুমার বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, এবার তার কাছ থেকে আফ্রিকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা যাবে। একদিন তার সাথে গ্রাম ভ্রমনে বের হয়ে সাগ্রহে যখন তার কাছে শুনতে চাইলেন তার ইতিহাস-ঐতিহ্যের গল্প, তখন তিনি অবাকই হলেন Fadipe এর অজ্ঞতা আবিষ্কার করে। সুনীতি কুমারের জবানিতে, "Fadipe ধর্মে খ্রীষ্টান। তাই সে বড় একটা নিজের জাতির পূর্বকথা সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত না" (*সাংস্কৃতিকী*, ৭০০)। এখানে স্পষ্টই ধরা পড়ে, নিজস্ব ইতিহাস-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে আনার এবং এই উপষঙ্গগুলো ভুলিয়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান tool বা অস্ত্র ছিল ভাষার মতোই ঔপনিবেশিকদের ধর্মও। আর এটা যখন বাহির থেকে আমদানী করা শাসকদের হেজেমনি বা আধিপত্যবাদের সাথে গলাগলি করে একাট্টা হয়ে যায়, তখন তো স্থানীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে কুসংস্কার আর ভাষাকে অশ্রাব্য কিচিরমিচির বলে হটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নির্মমভাবে জোড়ালো হয়ে ওঠেই। আমাদের ভারতবর্ষেও এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নগুগির *Petals of Blood* উপন্যাসের শেষের দিকে ওয়ান্‌জার গণিকালয়ে আগুন লাগিয়ে মানুষ হত্যার যে মিশন মিস্টার মুনিরা সম্পন্ন করে তার পেছনে উপনিবেশিকদের আমদানী করা ধর্মের প্রণোদনাই কাজ করেছিল সবচেয়ে বেশী। নামের মধ্যকার খ্রিষ্টীয় অংশ 'James' শব্দটি পরিহার করার পেছনে নগুগির সম্ভবত এই উপলব্ধিই খুউব জোড়ালো ভূমিকা পালন করেছে।

ভাষার ব্যাপারে এই যে নগুগির শক্ত অবস্থান এর পেছনে আফ্রিকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে প্রখর সচেতনতা জোড়ালো ভূমিকা রাখে। নগুগি জানেন আফ্রিকী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীরতা। তিনি এটাও জানেন ইউরোপ কতটা নিয়েছে আফ্রিকার কাছ থেকে। ফিউচারিজম, কিউবিজম ইত্যাদি তো আফ্রিকার কাছ থেকেই ইউরোপ নিয়েছে। তারপরেও শুধু শোষণের রাজনীতি চালু রাখতেই ইউরোপ প্রচার করেছে, আফ্রিকার কোন ইতিহাস নেই। ঔপনিবেশিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এটি। তারা দেশ জয় করেই স্থানীয়দের নাম, পরিচয় ও ভাষাকেই প্রথম আক্রমণ করে। কারণ এই তিন উপষঙ্গের ওপর ভর করেই স্থানীয়রা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রপঞ্চ তৈরী করে। "The Politics of Translation: Notes on African Language Policy" প্রবন্ধে নগুগি বলেন, " In the history of conquest, the first thing the victorious conqueror does is to attack people's names and languages (Ngugi 124). এই কাজ ইংরেজরা করেছে স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলসে, জাপানীরা করেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, আমেরিকা করেছে হাওয়াই দ্বীপে, পশ্চিম পাকিস্তান করতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ)।

বিশ শতকের প্রথম দিকে যেমনি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি ইউরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই পুরাতন, একঘেয়ে গ্রীক রেনেসার শিল্প ধারায় নতুনত্বের অভাবে

আগ্রহ হারাতে থাকলে ইউরোপ মনোযোগ দেয় আফ্রিকার প্রাচীন ও মৌলিক শিল্পের দিকে। শ্রীঘ্রই ইউরোপ উপলব্ধি করলো যে, তাদের প্রাচীন শিল্প গঠনের প্রয়াসকে ভূমিস্যাৎ করে তাকে নতুন করে গড়ে তোলার শক্তি আফ্রিকী শিল্পের আছে। সূনীতি কুমারের মতে, "এই শিল্পে যে-জগতের বাণী ইউরোপের কাছে আসিল, যে ভাবধারার সন্ধান ইউরোপ পাইল, তাহা একেবারে নতুন এবং প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদকারী।" শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতি গতানুগতিক প্রাচীন গ্রীক ও রেনেসাঁ যুগের শিল্পের চর্বিত চর্বন করে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, তখন এতে নতুনত্বের প্রাণরসের সঞ্চারও করে আফ্রিকী শিল্প-সংস্কৃতি। এ প্রসঙ্গে সূনীতি কুমারের পর্যালোচনা প্রনিধানযোগ্য। তাঁর কথায়:

> এতদিন ধরিয়া ইউরোপের যে–শিল্প কেবল প্রাচীন গ্রীক ও রেনেসাঁসের যুগের শিল্পের চর্বিত-চর্বণ করিয়া আসিতেছিল, ক্রমাগত প্রাচীনের গতানুগতিক ও সহজ অনুকরণে যে ইউরোপীয় শিল্প প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল, যে ইউরোপীয় শিল্প স্বাভাবিক ও অনিবার্য মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য আবার জীবনের সহিত যোগ খুঁজিতেছিল, শক্তিহীন সুষমতার পরিবর্তে শক্তিশালী মূঢ়তা চাহিতেছিল, যে ইউরোপীয় শিল্পের প্রাণ যেন শ্রান্ত ও উদ্দেশ্যহীন হইয়া আসিতেছিল, সেই ইউরোপীয় শিল্প আফ্রিকার আদিম শিল্পের প্রাণবন্ত শক্তির মধ্যে, এমন কি তাহার স্থূলতা ও বর্বরতার মধ্যে এক মৌলিক জীবনের সাড়া পাইল । (সূনীতিকুমার ৭১৬)

এই যে শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাস, তার ধারক ও বাহক কিন্তু ভাষা। এই ভাষা যদি আফ্রিকী না হয়ে ইউরোপীয় হয়, তবে তা পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধই রয়ে যায়। বিকৃত তো হয়-ই। এ-কথাতো নগুগি বলেনই যে, ভাষা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের অস্ত্রও বটে। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, পশ্চিম পাকিস্তানীদের আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তো তাদের nervousness বা স্নায়ুদৌর্বল্য থেকেই, যার উৎস ঐ যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভয় বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের তরফ থেকে। ভাষাতো শিল্প-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ্। একে সরিয়ে নিলে শিল্প–সংস্কৃতির অস্তিত্বও থাকে না। আর যে কোন জাতির বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হলো সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, আর এটি নিশ্চিত হয় তখনই যখন সেই জাতি তার নিজের ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা পায় (*Homecoming* ১১) |

ভাষার দ্বারা কিভাবে মন-মস্তিস্ককে শাসন করা যায়, তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করা যায় । ইউরোপীয়রা সেই ১৪৯২ সাল থেকেই প্রচার করে আসছে– কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। লক্ষ্য করুন, 'আবিষ্কার' শব্দটির মধ্যে বিশ্বের মন-মস্তিষ্ক শাসন করার কী রাজনীতিই না লুকিয়ে আছে। আসল ব্যাপারটা হলো এখানে 'আবিষ্কার' বা Discover শব্দটিকে ঔপনিবেশিকরণ বা Colonization শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? কলম্বস কী ১৪৯২ সালে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করলেন না? ঔপনিবেশিকরণের দ্বার তো উন্মুক্তই হলো এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কারণ ১৫০৭ সালে প্রথম আফ্রিকী দাস বোঝাই করা জাহাজ আমেরিকায় পৌঁছে তাঁর দেখানো পথ ধরেই। ভাষার কী রাজনীতি! কোথায় 'ঔপনিবেশিকরণ' আর কোথায় 'আবিষ্কার' - ভাষার এই কপট রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ারই সমান্তরালে চলে। প্রসঙ্গত: আজকে পুঁজিওয়ালাদের ইংরেজি, চাইনিজ, রাশিয়ান সহ অল্পকিছু ভাষার দাপটে বিশ্বের ৬০০০

ভাষার অনেকগুলোই টিকে নেই, আবার কিছু কিছু ভাষা আছে মুমূষু অবস্থায় (ডায়মন্ড ৮)। কাজেই বিশ্বায়নের অজুহাতে কর্পোরেট পুঁজিবাদীদের বিশ্বজুড়ে তৎপরতায় স্থানীয় ভাষাগুলো সত্যিই সংকটে পড়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নিশ্চয় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন নয়। উপায় হতে পারে গ্লোবালিজম। গ্লোবালিজম বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে প্রত্যেকের স্বকীয় পরিচয়কে হুমকির মধ্যে না ফেলেই। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং জাতি যখন নিজের ভাষায় নিজেকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে তখনই সে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে। আর এই প্রক্রিয়ার প্রধানতম মাধ্যমই হলো ভাষা, কারণ একটা ভাষাকে অধিকৃত করার অর্থ হলো সেই ভাষায় সংরক্ষিত সকল জ্ঞান, দর্শণ, ধারনা, বোধ ও বুদ্ধিরও অধিকার নিশ্চিত করা। এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, ঔপনিবেশিকদের ভাষায় আফ্রিকী সাহিত্য রচনার বিপক্ষে কেন নগুগির অবস্থান।

তথ্যসূত্র ঃ

Diamond, Jared. *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: Norton and Company Ltd.,1999. Print.

Ngugi, wa Thiong'o. *Decolonising the Mind*: *The Language of African Literature*. Britain: James Currey Ltd.,1986.

---. *Homecoming*, London: Heimemann, 1972. Print.

---. "The Politics of Translation: Notes on African Language Policy". In *Journal of African Cultural Studies,* 30:2, 2018.

সূনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *সাংস্কৃতিকী*, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭ (প্রথম অখন্ড প্রকাশ)

যতীন সরকার, *ভাষা বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: অক্ষর বিন্যাস, ২০১৫।

[i] উদ্ধৃত শ্লোকটি যতীন সরকার রচিত, *ভাষা বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে, পৃ. ১৩।